নারী অধিকার ও জেন্ডার সচেতনতা

তানিয়া কামরুন নাহার

সাধারণত আমাদের পরিবারগুলোতে দেখা যায়, ছেলেশিশুদের গাড়ি, বন্দুক, ক্রিকেট ব্যাট, বল জাতীয় খেলনা বেশি উপহার দেওয়া হয়। অন্যদিকে মেয়েশিশুদের উপহার দেওয়া হয় পুতুল, খেলনা হাঁড়িপাতিল ইত্যাদি। মনে করা হয়, রান্নাবান্না মেয়েদের কাজ। শৈশব থেকেই মেয়েদের ভেতরে মাতৃসুলভ স্নেহ ও মায়া মমতা তৈরি হয়, যেজন্য তারা পুতুল ও রান্নারান্না খেলতে বেশি পছন্দ করে। অপরদিকে ধরে নেওয়া হয় ছেলেশিশুরা দুরন্ত হবেই, তারা দৌড়ঝাঁপ করতে বেশি পছন্দ করে। তাই ওদেরকে মাঠে খেলার উপযোগী খেলনা দেওয়া হয়ে থাকে। এভাবে আমরা ছোট শিশুদের মনের ভেতরে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পুরোনো ধ্যান ধারণাগুলো ঢুকিয়ে দিই।

কে কোন খেলনা দিয়ে খেলতে পছন্দ করবে, তা একেবারেই শিশুর নিজস্ব ব্যক্তিগত পছন্দ, রুচি ও ইচ্ছের ব্যাপার। কিন্তু এর মধ্যেও আমরা লৈঙ্গিক পার্থক্যের বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে ছেলেমেয়েদের খেলনা ও খেলার বিষয়ে বৈষম্য তৈরি করছি। অথচ শিশুরা তার চারপাশে যা দেখে সে সবেরই অনুকরণ করে। তাই সে তার মায়ের মতো রান্না করতে পছন্দ করে, মায়ের প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করতে চায়। মেয়েশিশু হলে এগুলোকে আমরা স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিই। কিন্তু ছেলেশিশুটিও যখন তার মাকে অনুকরণ করে রান্নার কাজ করতে চায় বা মায়ের মতো লিপস্টিক নেইলপলিশ মাখতে চায়, তখন আমরা ছি ছি করে উঠি। আর ছোট্ট শিশুটির মনে গেঁথে দিই একটি পুরোনো ধারণা, 'ছেলেরা এসব করে না, এগুলো মেয়েদের কাজ'। এভাবেই মেয়েদের কাজ ও ছেলেদের কাজ বলে একটি অবান্তর ধারণা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে গড়ে উঠেছে। যার ফলে রান্নাসহ সকল গৃহস্থালি কাজ হয়ে উঠেছে কেবল নারীর কাজ! আরো মনে করা হয়, এসব কাজ করলে ছেলেশিশুদের মধ্যে মেয়েলি ভাব প্রকট হয়ে যাবে, সে পুরুষসুলভ আচরণ আর করবে না। জেন্ডার সচেতনতা না থাকায় নারী-পুরুষ, এমনকি শিশুরাও এমন ভ্রান্ত ধারণা লালন করে আসছে যুগের পর যুগ। ফলে রান্না করাসহ অন্যান্য যে জীবনদক্ষতাগুলো ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সকল মানুষের থাকা দরকার, তা ছেলেশিশুদের মধ্যে তৈরি হয় না। এমনকি অনেক অভিভাবক গর্ব করে বলেও থাকেন, 'আমার ছেলে তো তার বোনের সাথে পুতুল খেলে না! ও বলে, পুতুল খেলা, রান্না করা এসব মেয়েদের কাজ'।

পৃথিবীতে পদার্পণের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই একটি ছোট্ট শিশুর মনে এমন ভ্রান্ত ধারণাগুলো এমনি এমনি তৈরি হয়ে যায় না। জেন্ডার অসচেতন অভিভাবকরা শিশুদের এসব শেখান বলেই, সন্তানও ওভাবেই গড়ে ওঠে। অভিভাবকরা সচেতন হলে সন্তানের ভুল ধারণা অবশ্যই তাৎক্ষণিকভাবে শুধরে দেবার কথা। কিন্তু বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতায় সে আশা নিতান্তই দুরাশা।

ছেলেশিশুদের মধ্যে যেমন সব জীবনদক্ষতা তৈরি হয় না, তেমনি সাইকেল চালানোর মতো জীবনদক্ষতাগুলোও মেয়েদের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে থাকে না। মনে করা হয়, সাইকেল চালালে মেয়েদের শারীরিক গঠন বদলে যাবে, সে পুরুষালি হয়ে উঠবে। সেই সাথে মাঠে খেলতে যাওয়া থেকে শুরু করে স্কুলে পড়ার মতো অধিকার থেকেও মেয়েশিশুরা বঞ্চিত হয় কেবল তাদের অভিভাবকদের মধ্যে জেন্ডার সচেতনতা না থাকায়। এমনকি বাল্যবিয়ের মতো ঘটনাগুলোও জেন্ডার সচেতনতার অভাবেই ঘটে থাকে। অভিভাবকেরা মনে করেন, মেয়েদের এত পড়ার কী দরকার? তাই শারীরিক পরিবর্তন হবার সাথে সাথেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেবার জন্য জোর প্রস্তুতি শুরু করে দেন।

এভাবেই শৈশব থেকে শুরু করে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ সবাই জেন্ডার বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। তাতে নারীরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জেন্ডার অসচেতনতার কারণে নারীর মেধা ও যোগ্যতাকে অবমূল্যায়ন করা হয়ে থাকে বেশিরভাগ কর্মক্ষেত্রে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ, দায়িত্বশীল ও চ্যালেঞ্জিং কাজগুলো অনেক সময় নারীরাও এড়িয়ে চলেন। তারা মনে করেন, এসব পুরুষের কাজ, তারা এসব পারবেন না।

পরিবারে নারীদের বাড়তি কাজ করতে হয়। কেননা, নারীর জেন্ডার অসচেতন সঙ্গীর জীবনদক্ষতায় ঘাটতি থাকে এবং পুরোনো ধ্যান ধারণার কারণে নারী ঘরের কাজে কারো সাহায্য পায় না। ফলে তার জীবন আরো জটিল হয়ে পড়ে। কর্মক্ষেত্রেও পুরুষের কাজকে বেশি গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে, নারীর যোগ্যতা থাকার পরেও। পথেঘাটে এমনকি কর্মক্ষেত্রেও নারীর যৌন হেনস্তার শিকার হওয়াকেও যেন সকলে মেনেই নিয়েছে। কেননা, পুরুষ মানুষ তো অমন করবেই, নইলে তার পুরুষত্ব প্রকাশ পায় না। এমন অসংখ্য উদাহরণ আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে।

জেন্ডার অসচেতনার ফলে শুধু নারীর জীবনই যে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে তা নয়। আমরা পুরুষদের হাজারো দুঃখেও কাঁদতে দিই না। একটু কেঁদে তাকে হালকা হতে দিই না। পুরুষ মানুষের উপরে পুরো সংসারের দায়িত্ব চাপিয়ে তাকে কলুর বলদ বানিয়ে রাখি। অন্যদিকে নারীকে বলা হয়েছে, 'এসব তোমার কাজ নয়'। তাই নারীও যেমন পুরুষের সমব্যথী হয়ে উঠতে পারছে না, তেমনি পুরুষেরাও পারছে না নারীর সমব্যথী হয়ে উঠতে। বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরস্পর প্রভু-ভৃত্য কিংবা তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠার এক অসুস্থ চিত্রই সর্বত্র দেখা যায়।

এভাবেই জেন্ডার সচেতনতা না থাকায় নারীরা তাদের অধিকার বঞ্চিত হয়ে থাকেন এবং তারা বুঝতেও পারেন না যে, তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। কিছু ক্ষেত্রে নির্যাতিতও হচ্ছেন। এরপরেও নারীরা এসব বিনাবাক্য ব্যয়ে মেনে নিচ্ছেন। কারণ তারা এমন ঘটনা যুগ যুগ ধরে ঘটতে দেখে এসেছেন। ফলে তারা ধরেই নিয়েছেন যে, এমন ঘটাই স্বাভাবিক। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অনাচারগুলোও তাই ঘরে, বাইরে, কর্মক্ষেত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, নারীদের দমিত-

নমিত করে রাখবার জন্য। ইদানিং আবার কেউ কেউ নিজেদের জেন্ডার সচেতন বলে দাবি করলেও, দিনশেষে দেখা যায়, তারাও সেই পুরুষতান্ত্রিক ধারণাগুলোই মনেপ্রাণে ধারণ করে চলেছেন। এর ফলে নারীকে আগের মতোই অধিকার বঞ্চিত থেকে যেতে হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যমান অবস্থায় কোনো পরিবর্তনই আসে নি। বর্তমানে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেলেও, এক দুষ্ট চক্রের ঘোরপাকে পড়ে নারীর ক্ষমতায়ন এখনো নিশ্চিত হয় নি, আজও নারীকে স্রেফ যৌনপণ্য হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। এখনো লৈঙ্গিক বৈষম্য তৈরি করা হয়। কারণ, শিক্ষিত হলেও অনেক নারীই জেন্ডার সচেতন নয়। এমনকি পুরুষরাও জেন্ডার সচেতন নয়। জেন্ডার ও সেক্সকে প্রায় একইভাবে তারা বিচার করে থাকে। তাই জেন্ডার ও সেক্সের পার্থক্য সম্পর্কে সবার সচেতন হওয়া খুব প্রয়োজন।

সেক্স কী?

সেক্স নারী-পুরুষের জৈবিক ও লৈঙ্গিক পরিচয়। এটি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ব্যাপার। যেমন পুরুষের মুখে দাঁড়ি-গোঁফ গজায়, তা সে বাংলাদেশের হোক বা আমেরিকার। একইভাবে নারীর মাসিক হওয়া, গর্ভধারণ করার ঘটনাগুলোও একেবারেই প্রাকৃতিক। প্রাকৃতিক কারণে পুরুষের দেহে সেক্স ক্রোমোজোম এক্স ও ওয়াই রয়েছে, আর নারীর দেহে রয়েছে দুটি এক্স ক্রোমোজোম। সারা বিশ্বের সকল নারী ও পুরুষের জন্য এটি সত্য। তবে অনেকে সার্জারির মাধ্যমে নিজের দেহে কিছুটা পরিবর্তন এনে ট্রান্সজেন্ডারে রূপান্তরিত হতে পারে। এরকম একাধটা ব্যতিক্রম থাকলেও সেক্স ও জেন্ডার সংক্রান্ত ধারণা মিথ্যা হয়ে যায় না।

জেন্ডার কী?

জেন্ডার একেবারেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণে সৃষ্ট। এর পেছনে রাজনীতিও থাকে প্রায় সময়। তবে জেন্ডার প্রাকৃতিক নয় কখনোই। অর্থাৎ জেন্ডার কখনোই নারী-পুরুষের জৈবিক/লৈঙ্গিক পরিচয় বা সেক্স নয়। এটি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত, যা নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করে।

জেন্ডার সচেতন হলেই একজন বুঝতে পারেন নারীরাও সাইকেল, গাড়ি, প্লেন চালাতে পারে, এভারেস্টে যেতে পারে, প্যারাট্রুপার হতে পারে, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে, গবেষক হতে পারে ইত্যাদি। তেমনি পুরুষেরাও পারে রান্না করতে, ঘর গুছিয়ে রাখতে, সন্তান লালনপালন করতে, কাপড় কাচতে, ঘর মুছতে বা ইত্যাকার কাজ করতে। নারীর কাজ বা পুরুষের কাজ বলে আসলে কিছু নেই।

জেন্ডার স্থানকালভেদে বদলে যেতে পারে। কোনো একটি স্থানের ভৌগোলিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে জেন্ডার আলাদা হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আজ থেকে প্রায় দু'শ বছর পূর্বের মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারগুলোতে নারীদের মধ্যে

কঠোর পর্দাপ্রথার প্রচলন ছিল। ঘরের বাইরে তাদের বের হওয়াই নিষেধ ছিল। পরপুরুষের সাথে কথা বলা বা মুখ দেখানোও ছিল গর্হিত কাজ। এগুলো সেই সময়ের জেন্ডার। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে তা অনেকখানি বদলে গেছে। নারীরা এখন নিজের পছন্দমতো শাড়ি, জিন্স, হিজাব, বোরকা পরেন। বোরকা পরলেও ঘরে বন্দি জীবন কাটান না। আবার বোরকার রং যে শুধু কালোতেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন, তাও নয়। তারা এখন নানারকম রং, নকশা ও কাটিং-এর বোরকা পরছেন। এমনকি পুরুষ সহকর্মীদের সাথে তারা কাজও করছেন। পুরুষ অভিভাবকের পাহারা ছাড়াই একা একা চলাফেরা করতে পারছেন। এর মানে সময়ের সাথে সাথে জেন্ডার পালটে গেছে। কিন্তু নারী-পুরুষের জৈবিক রূপ অর্থাৎ সেক্স সেই আগের মতোই রয়ে গেছে, যা স্বাভাবিক।

এক সময় সৌদি আরবে নারীদের গাড়ি চালানো নিষিদ্ধ ছিল। বর্তমানে এ নিষেধাজ্ঞা বাতিল হয়েছে। সৌদি নারীরা আনন্দের সাথেই গাড়ি চালাচ্ছেন। এগুলো হচ্ছে জেন্ডারের উদাহরণ। তাতে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়, সমাজই জেন্ডার নির্ধারণ করে। সমাজ বদলে গেলে, সামাজিক মূল্যবোধ বদলে গেলে, জেন্ডারও বদলে যাবে। ধীরে ধীরে কিছু ক্ষেত্রে জেন্ডার সামান্য পালটালেও সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে, জেন্ডারের মূলরূপ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এখনো সেই কয়েক যুগ আগের মতোই রয়ে গেছে। কিছু উদাহরণ দিলে নিশ্চয়ই বোঝা যাবে।

একটু আগেই উদাহরণে আমরা দেখেছি, বর্তমান নারীরা দু'শ বছরের পুরোনো সেই কঠোর পর্দাপ্রথা মানছেন না। আবার উলটো দিকে আমরা দেখছি, নিতান্ত শিশুদেরও বোরকা হিজাব পরতে বা পরার অভ্যাস করতে বাধ্য করা হচ্ছে। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও মেয়েশিশুদের ইউনিফর্ম হিসেবে বোরকা বা হিজাব নির্ধারণ করা হচ্ছে। শিশুদের এখানে লৈঙ্গিক কারণে আলাদা চোখে দেখা হচ্ছে। ওরা স্রেফ শিশু নয়, বরং মেয়েশিশু অর্থাৎ যৌনপণ্য, এ ধারণাই প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। যৌনপণ্য বলেই তাকে আলাদা করে বোরকা পরা বা পরার অভ্যাস করানো হচ্ছে। অথচ ছেলেরা উলটো এমন শিক্ষা পাচ্ছে, কেবল মা কিংবা বোন হলেই নারীদের সম্মান করা যাবে, নইলে নয়। অর্থাৎ মা ও বোন ছাড়া অন্য সকল নারী পুরুষের চোখে যৌনপণ্য। তাই নারীও সর্বদা চেষ্টা করে নিজের ভেতরে মাতৃসুলভ ঘরোয়া আচরণ যেন বিকাশ লাভ করে। পেশাদার আচরণ সে আয়ত্ত করতে পারে না বা করে না, কারণ সমাজের কাছেও মাতৃসুলভ আচরণই কেবল কাম্য। এর বাইরে গেলেই নারী যৌনপণ্য আর পুরুষ তার খদ্দের। জেন্ডার সচেতনতা থাকলে এমন অসুস্থ ধারণাগুলো থেকে নারী ও পুরুষ উভয়েই রক্ষা পেতে পারত।

যে কোনো ব্যক্তিই তার নিজস্ব সম্মানবোধ নিয়ে থাকবেন। এমনকি কেউ যদি যৌনকর্মীও হয়, সেও সম্মান পাবার যোগ্যতা রাখে। জেন্ডার সচেতন হলে, পর্দার নামে বাড়তি পোশাক পরে সম্মান অর্জন করার প্রয়োজন আর কারো পড়ে না। এমনকি কোনো নারী দিনের বেলায় ঘর থেকে বের হলো নাকি রাতে, এগুলোও জেন্ডার সচেতন ব্যক্তি বিচার করতে বসেন না। কেননা, দেশের

সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের যে কোনো সময়, যে কোনো স্থানে চলাফেরার অধিকার রয়েছে।

জেন্ডার অসচেতনতার আরেকটি বড়ো উদাহরণ হচ্ছে, পিতার সম্পত্তিতে পুত্র ও কন্যার অধিকারে বৈষম্য থাকা। কন্যার ভাগ সব সময় এখানে কম, কারণ তার লৈঙ্গিক পরিচয়। অথচ মাতৃগর্ভে সকলেই নয় মাস থাকে। কেবল নারী হবার কারণে সম্পত্তিতে সমঅধিকার সে পায় না। যদি কেউ এমন দাবি তোলে, তবে তাকে এমন চোখে দেখা হয় যে সে রীতিমতো গর্হিত কাজ করে ফেলেছে। জেন্ডার অসচেতনতার কারণে মনে করা হয়, নারী তার ভাইয়ের চেয়ে কম ভাগ পাবে। যুক্তি দেওয়া হয়, নারী তার স্বামীর সম্পত্তির ভাগও পায় এবং সংসারের অর্থনৈতিক দায়িত্ব থেকে তাকে মুক্ত রাখা হয়। পালটা যুক্তি হিসেবে বলা যায়, স্ত্রীর সম্পত্তিতে যদি পুরুষের ভাগ থেকে থাকে, তবে সে কেন পিতার সম্পত্তিতে বোনের চেয়ে বেশি ভাগ পাবে?

সংসারের অর্থনৈতিক দায়দায়িত্ব থেকে নারীকে মুক্ত রাখার মানে হচ্ছে, নারীর ক্ষমতায়নের স্থানটিকে সংকুচিত করা। নারীকে অর্থনৈতিকভাবে পরাধীন বানিয়ে রাখার একটি পুরুষতান্ত্রিক চক্রান্তই বলা যায় একে। অথচ জেন্ডার সচেতনতা থাকলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই যে অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হওয়া দরকার, এই সহজ কথাটি সবাই বুঝতে পারত। অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হবার জন্য তখন প্রত্যেক নাগরিকই রাষ্ট্রের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার কাজ করতে পারত। তাই রাষ্ট্রের স্বার্থেও নাগরিকদের মধ্যে জেন্ডার সচেতনতা তৈরি করতে হবে। নচেৎ রাষ্ট্রের নাগরিকদের অর্ধাংশ নারীকে অর্থনৈতিক কাজগুলো থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হবে। তারা থাকবে পরমুখাপেক্ষী, পরনির্ভরশীল ও অর্থনৈতিকভাবে পরাধীন হয়ে। তাতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের পক্ষে তাদের সহজেই অধিকারবঞ্চিত ও নির্যাতন করা সহজ হবে।

পিতার সম্পত্তিতে কন্যার ভাগ কম বলে, সন্তানের মধ্যেও পিতামাতারা বৈষম্য সৃষ্টি করে থাকেন। পুত্রসন্তান সম্পত্তিতে বেশি ভাগ পাবে, তাই তার প্রতি পিতামাতার প্রত্যাশার চাপও বেশি থাকে। অপরদিকে কন্যাকে করা হয় অবহেলা। কত দ্রুত তাকে বিয়ে দিয়ে অন্যের হাতে সোপর্দ করে দেওয়া যায় অভিভাবকরা সব সময় সে চেষ্টা করে যেতে থাকেন। যা মোটেই কাম্য নয়।

জেন্ডার অসচেতনতার আরেকটি দিক হলো, চাকরি ক্ষেত্রে নারীর জন্য কোটা। কোটার ফলে যোগ্যতাসম্পন্ন পুরুষকে টপকে অনেক সময় কম যোগ্য নারী চাকরির সুযোগ পেয়ে যান। অথচ কর্মক্ষেত্রে মেধা ও যোগ্যতাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত এবং এগুলোরই চর্চা থাকা উচিত। চাকরির জন্য যে নারী আবেদন করবেন বা পরীক্ষা দেবেন, তাকে একজন পুরুষের মতোই শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হয়। অর্থাৎ এখানে সবাইকে একইরকম যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হয়। এটা কোনো জৈবিক/প্রাকৃতিক ঘটনা নয়। এটি জেন্ডারের মধ্যে পড়ে। তাই সাদা চোখে দেখতে গেলে নারীদের এখানে কোটার সুবিধা নেবার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু সামগ্রিকভাবে যদি বিবেচনা করা হয়, তবে দেখা যাবে, বাংলাদেশের নারীরা অনগ্রসর জাতি।

পরিবার ও সমাজের অনেক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে নারীদের শিক্ষার অধিকার আদায় করে নিতে হয়, শিক্ষাগত সনদ অর্জন করতে হয়। নারীর জন্য এটি অনেক বড়ো চ্যালেঞ্জ। পড়ালেখা করানোর চাইতে তাদের অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে দেবার ব্যাপারেই অধিকাংশ পরিবার থেকে বেশি জোর দেওয়া হয়। সেজন্য অনেককে বিয়ের পর সন্তান ও সংসার সামলেই পড়ালেখা চালিয়ে যেতে হয়। শুধু অভাবগ্রস্ত পরিবারে নয়, অবস্থাপন্ন পরিবারগুলোতেও মনে করা হয়, মেয়েমানুষ এত পড়ার দরকার কী? মেয়েকে কিছুদিন পরেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে, সুতরাং তার এত পড়ার দরকার নেই।

এ ছাড়া, স্কুল-কলেজে যাবার পথে তাদের প্রতিনিয়ত যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়। পিরিয়ড চলাকালে তাদের অনেকে স্কুল/কলেজে যেতে পারে না। কারণ, অধিকাংশ বিদ্যায়তনে প্রয়োজনীয় টয়লেট, খাবার পানি বা বিশ্রামের ব্যবস্থা নেই। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, শিক্ষাগত সনদ অর্জনের ক্ষেত্রে পুরুষদের এরকম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় না। এত চ্যালেঞ্জের সাথে পাল্লা দিয়ে মেধা থাকা সত্ত্বেও অনেক মেয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে চূড়ান্ত সফলতা দেখাতে পারে না। সম্ভাবনাময় অনেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ঝরে যেতেও বাধ্য হয়। এমনকি উপবৃত্তির আশা দেখিয়েও অনেকের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায় না। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সাম্য নিশ্চিত করতে মেয়ে বা নারীদের প্রতি অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশন বা ইতিবাচক উদ্যোগ নেবার প্রয়োজন হয়। চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা ওরকমই একটি ইতিবাচক উদ্যোগ। এ ধরনের বিশেষ উদ্যোগ শত শত বছর ধরে নারীর অধিকারের প্রতি সমাজ-রাষ্ট্রের যে বঞ্চনা বিদ্যমান আছে তার জন্য এক ধরনের ক্ষতিপূরণ। এর লক্ষ্য বিপুল পরিমাণ বৈষম্যকে কমিয়ে এনে সমতায় পৌঁছুবার সীমারেখাক নিকটবর্তী করা। নীতিগতভাবে এ ধরনের উদ্যোগ দিনের পর দিন চালু রাখবার প্রয়োজন নেই। সমাজ-রাষ্ট্র যখন নারীর সমান অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে, সকল পর্যায় থেকে যখন বৈষম্য বিলুপ্ত হবে, তখন এ ধরনের উদ্যোগের আর প্রয়োজন হবে না। আমরা চাই আমাদের সমাজটা এমন অবস্থায় উপনীত হোক, যেখানে কারো প্রতিই বিশেষ কোনো উদ্যোগের প্রয়োজন হবে না, যেখানে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, জাতিসত্তা, জন্মস্থান, শারীরিক অবস্থা নির্বিশেষে সকল নাগরিক সংবিধান কথিত সমান অধিকার ভোগ করতে পারবে।

তানিয়া কামরুন নাহার লেখক। tanya.kamrun@gmail.com